আধ্যাত্মিক-রহস্য

(২)

শিবের বুকে শ্যামা কেন?

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা।

উপনিষদ-রহস্য কার্য্যালয়, শ্রীগুরু-মন্দির, কোঁড়ার বাগান
হইতে
শ্রীকুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
৫নং নূর মহম্মদ লেন, এলবিয়ন প্রেস হইতে
শ্রীবামাচরণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

জন্মাষ্টমী—ভাদ্র ১৩৩৫ সাল।

মূল্য ।০ আনা।

তৃতীয় সংস্করণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল। ইহাতে কোন পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।

মুখবন্ধ।

আধ্যাত্মিক রহস্যের দ্বিতীয় রহস্য "শিবের বুকে শ্যামা কেন?" নামে প্রকাশ করিলাম। "মা আমার কাল' কেন?" নামক প্রথম রহস্য যখন প্রকাশিত হয়, তখন সে পুস্তকখানি সাধারণে যেরূপ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই মনে হয়, আজিকার ঘোর ধর্ম্মবিপ্লবের দিনেও অনেক তৃষিত চক্ষু সাধনা-ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া আছে, সুতরাং এ রহস্য প্রচার অসাময়িক হয় নাই।

কিন্তু এই শ্রেণীর পুস্তকের উদ্দেশ্য অনেক পাঠক সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেও কেহ কেহ একটু ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়াছেন দেখিলাম। এবং সেই জন্য এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতেছি। "মা আমার কাল' কেন?" পুস্তিকাখানি সংবাদ পত্র সমূহে সমালোচিত হইয়াছিল। সমালোচনা সকল প্রশংসাবহুল হইলেও তন্মধ্যে দুইটী সমা-

লোচনায় দুইটী ভ্রান্ত ধারণার আভাস প্রকাশিত হইয়াছে। একজন সমালোচক ইহাকে সাম্প্রদায়িক ভাববিশিষ্ট বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, অন্য একজন পুস্তকখানি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া লিখিত হইয়াছে, এরূপ মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ভগবান ইহাদিগের চক্ষের সংকীর্ণতা ঘুচাইয়া দিন!

এই পুস্তিকাগুলি সাম্প্রদায়িক নহে। আমাদিগের শাস্ত্রে দেবতাসকলের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অভ্যন্তরে যে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে সেই বৈজ্ঞানিক মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া সাধারণের চক্ষে প্রতিফলিত করাই এ রহস্য প্রচারের উদ্দেশ্য। হিন্দুশাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরটী যে পূর্ণ বিজ্ঞানের প্রকাশক, এ কথা আজ হিন্দু বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত বল হারাইয়াছে। পুস্তকের উদ্দেশ্য হিন্দুর সেই বিজ্ঞানের মহিমা প্রচার করিয়া কৃতার্থ হওয়া। শ্যামা, ব্রহ্মা বা বিষ্ণু মহেশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ যে কোন দেবতার নামই প্রবন্ধে পরিদৃষ্ট হউক না কেন, পুস্তিকা তৎ তৎ দেবতার

সাধক সম্প্রদায়ের জন্যই যে লিখিত হইয়াছে, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হওয়া অযুক্তি সঙ্গত। প্রতি দেবতার ভিতর কি কি সত্য লুক্কায়িত—কোন্ কোন্ বিজ্ঞান পুঞ্জীভূত; বিশেষ বিশেষ দেবতায় কোন্ কোন্ বিশেষ বৈজ্ঞানিক ঘটনা নিহিত তাহাই পুস্তকের লক্ষ্য। মহেশ্বরের নাম দেখিয়া এই পুস্তককে শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত,—শ্যামার নাম দেখিয়া শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত অথবা শ্রীকৃষ্ণের নাম দেখিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ভাবিলে পাঠক লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, আমাদিগের শাস্ত্র যিনি একটু মনোনিবেশের সহিত পাঠ করিয়াছেন তিনিই জানেন, যে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা আলোচিত হইয়াছে, সে সকলই হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্গত; এবং ঋষিদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত ও বিশ্লেষিত।

"মা আমার কাল' কেন ?" নামক পুস্তিকায় স্পন্দন ও বর্ণতত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহার ভিত্তি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান নহে, ইহার ভিত্তি

বেদ। বেদে স্পন্দনতত্ত্ব বিশেষভাবে উল্লিখিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও স্পন্দনতত্ত্ব সাংখ্য যোগের মধ্যে ব্যাখ্যাত। হিন্দুর এমন কোন অভাব নাই, যাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ঘুচাইতে পারে।

সুতরাং পুস্তকখানি সাম্প্রদায়িকও নহে; পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিতও নহে। তবে সাম্প্রদায়িক মতের সহিত ও পাশ্চাত্য মতের সহিত খুঁজিলে সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় এই পর্য্যন্ত। সাধারণ সাম্প্রদায়িক মতভেদ তিরোহিত করা পুস্তকের অন্যতম উদ্দেশ্য। সাধনাক্ষেত্রে সম্প্রদায় নাই,—স্তর আছে। এ পুস্তক পাঠ করিয়া যাঁহারা এ তত্ত্ব না বুঝিবেন তাঁহাদিগের পুস্তক পাঠ বিড়ম্বনা মাত্র।

শিবের বুকে শ্যামা কেন ?

অবতরণিকা

অমাবস্যার ঘন অন্ধকারমাখা নিঝুম রাত্রি; সে অন্ধকারের শিরে অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জখচিত স্তব্ধ আকাশ। চারিদিক স্তব্ধ—সমগ্র বিশ্ব স্তব্ধ হইয়া ঘুমাইতেছে—বায়ুপ্রবাহ স্তব্ধ হইয়া বহিতেছে—পৃথিবী যেন সেই অন্ধকার-সমুদ্র দেখিয়া স্তব্ধভাবে গতিহীনা হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। ভগবৎ-অন্বেষী সাধকের প্রাণের প্রথম বিষাদ ভাব অপেক্ষা এ অন্ধকার বুঝি আরও বিভীষিকাময়!

সেই নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া ত্রিস্রোতা নদী স্তব্ধভাবে বহিয়া যাইতেছিল। সেই নদীর তীরে নির্জ্জন শ্মশান। অন্ধকার সেথা আরও বিভীষিকাময়। প্রকৃতি যেন চারিদিক হইতে কৃষ্ণা নগ্না রাক্ষসী-বেশে গ্রাস করিতে আসিতেছিল।

অন্ধকার সজীব ! মৃত্যুভয় তাহার করাল অভিব্যক্তি ! সে শ্মশানে সেই ভাব পূর্ণভাবে প্রকটিত।

সেই শ্মশানের এক প্রান্তে একটী নগ্ন শবদেহ হস্তপদ বিস্তার করিয়া শায়িত। চারি পার্শ্বে চারিটী কাষ্ঠস্তম্ভে কৃষ্ণসূত্রের সহিত সেই দেহটীর হস্তপদ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। অন্ধকার সে মূর্ত্তিতে আরও ঘনীভূত। সেই শবদেহের বক্ষের উপর জনৈক সাধক মুগ্ধনেত্রে সিদ্ধাসন করিয়া উপবিষ্ট। আকাশ হইতে নক্ষত্ররাজি উগ্রদৃষ্টিতে যেন সেই সাধকের দিকে চাহিয়াছিল। বিভীষিকা যেন সেই সাধককে গ্রাস করিবার জন্য মূর্ত্তিমতী হইয়া সে শ্মশানে অবস্থান করিতেছিল। পৃথিবী যেন শবাসন সহিত সেই সাধককে সেইখানে শূন্যে রাখিয়া পদতল হইতে সরিয়া যাইতেছিল। শবদেহ অচল অটল—সাধক বুঝি তাহা অপেক্ষাও অচল—তাহা অপেক্ষাও স্থির, অটল।

প্রহরের পর প্রহর অতীত হইতেছিল। শিবাকুল প্রহরান্তে একবার করিয়া বিকট শব্দে

শিবের বুকে শ্যামা কেন ?

প্রথম পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্যাস্থির।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটী একটী শবসাধনার দৃষ্টান্ত। শবসাধনা এ বিরাট সৃষ্টিতত্ত্বের আদর্শ ছবি। "মা আমার কাল, কেন" পুস্তিকায় আমি বলিয়াছি, জীবমাত্রেই সাধক। ধূলিকণা হইতে হরি, হর, ব্রহ্মাদি সকলেই সাধক মাত্র। দৃষ্টি উন্মেষিত হইলে এ তত্ত্ব বুঝা যায়, তাহাদের সে সাধনার প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, ও বুঝিতে পারা যায়—তাহারা শব সাধনায় ব্যাপৃত। অনন্তবিস্তৃত মহাশূন্যে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহার প্রত্যেক পরমাণু শবাসনে উপবিষ্ট হইয়া শক্তি-সাধনায় নিমগ্ন।

সাধক হইতে হইলে আগে সাধকের সন্ধান করিতে হয় ; কোথায়—জগতের কোন্ নিভৃত কোণে বসিয়া কোন মহাপুরুষ অমৃত প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া, নিত্যানন্দে বিভোর হইয়া আছেন, তাহার সন্ধান করিতে হয়। তীর্থযাত্রা করিতে যেমন সাথীর আবশ্যক, বিরাট সাধনামন্দিরে প্রবেশ করিতে তদ্রূপ সাধকের সঙ্গ প্রয়োজন। অথবা তীর্থযাত্রা করিতে গেলে, তীর্থের যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই যেমন সতীর্থ মেলে, সাধনা মন্দিরের যতই নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই তদ্রূপ সাধক সকলের সন্ধান পাওয়া যায়। ততই ক্রমশঃ জীবে জীবে অণুতে অণুতে সাধকের লক্ষণ সকল প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়, ও সে সাধনার প্রণালীও ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হইয়া উঠে।

সাধক সকলের সহিত ক্রমশঃ পরিচিত হওয়া, বা জগৎকে সাধনা মন্দির বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া সাধক হইবার একটী প্রধান বাহ্যিক লক্ষণ।

সাধক না হইলে সাধনাতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না। অর্থাৎ সাধনাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিলে, তবে

সেই প্রেত-ভূমিকে আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিতেছিল। মৃত্যু যেন বিকট-স্বরে জীব-জগৎকে গ্রাস করিবার জন্য আহ্বান করিতেছিল। শবদেহ অচল—নীরব। সাধক অচল রবহীন। কে জানে, সে মৃত্যুর আহ্বান সাধকের কানে পৌঁছিতেছিল কি না!

প্রহরের পর প্রহর অতীত হইতেছিল—প্রহরে প্রহরে বিভীষিকা গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছিল—প্রহরে প্রহরে মৃত্যু সাধককে গ্রাস করিবার জন্য শিবারূপে ডাকিয়া জাগাইবার চেষ্টা করিতেছিল। মৃত্যু-রাক্ষসী মরা মানুষকে খায় না; তাই 'যেন' সাধক মৃত কি জীবিত ডাকিয়া পরীক্ষা করিতেছিল।

শবদেহ অচল—স্থির! সাধক অচল অবিকম্পিত—স্থির।

এইরূপে তিন প্রহর অতীত হইল। বিভীষিকা চঞ্চল হইল। নক্ষত্রের তীব্র দৃষ্টিবেগ শ্লথ হইয়া আসিল। জাগরণ-দেবী জগৎকে স্পর্শ করিবার জন্য যেন করপ্রসারণের উদ্যোগ করিল।

সেই মরণ ও জীবনের সঙ্গম সময়ে—সেই মরণ ও জীবনের সঙ্গমস্থলে—সেই মরণ ও জীবনের আদর্শ-স্বরূপ সাধকের জীবন কাঁপিয়া উঠিল। শবদেহ স্পন্দিত হইল—ধনুর আকারে, ধরণী পৃষ্ঠ হইতে ফুলিয়া উঠিয়া সাধককে আসনচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইল। ভূমিকম্পের সময় পর্ব্বতের মত সেই সাধকের দেহ টলিতে লাগিল, পড়িল না। শবমুখে দশনে দশনে ঘর্ষিত হইয়া কড়্ কড়্ শব্দ হইতে লাগিল, হস্তপদ আকুঞ্চিত হইয়া, শব বন্ধন ছিঁড়িবার উপক্রম করিতে লাগিল। সে মৃতদেহ মুখব্যাদান করিল। সাধক পড়িল না, স্থির!

সহসা এক গম্ভীর চীৎকারে সে শ্মশান-ভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। গম্ভীর স্বরে সাধক হাঁকিল "অালেখ্—ব্যোম্"।

ব্যোমমণ্ডলের অণু পরমাণু সেই "ব্যোম্" শব্দে পরিকম্পিত হইল। বিশাল ব্যোমের অন্ধকাররূপ জটাজাল যেন দুলিয়া উঠিল। আঁধার সমুদ্রে যেন তরঙ্গ উদ্বেলিত হইল। সাধকের সম্মুখে সে তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিঘাতে যেন একটা কৃষ্ণ তরঙ্গের

চক্রাবর্ত্তন রচিত হইল। আর মুহূর্ত্তে সমুদ্রে বাড়বানলের মত সে আবর্ত্তনের ভিতর জ্যোতি-মণ্ডল দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল

সাধক আবার হাঁকিল, "আলেখ্—ব্যোম্!"

পৃথিবী সরিয়া গেল—আকাশ সরিয়া গেল,—বস্তুমাত্র, পদার্থমাত্র কে কোথায় অন্তর্হিত হইল। সাধক শুনিল, কে যেন বলিতেছে "আমি আসিয়াছি।" মৃতদেহে যেন প্রাণসঞ্চার হইল, সাধকের রুদ্ধ চক্ষু উন্মীলিত হইল—দেখিল, দিগ্-দিগন্ত শুভ্র রজতদ্রববৎ জ্যোতিঃস্রোতে উদ্ভাসিত, আর সেই জ্যোতিঃর মধ্যস্থলে এলোকেশী নৃমুণ্ডমালিনী বরাভয়করা—তা'র মা লক্ষ লক্ষ জন্ম যাহার অন্বেষণে ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিয়াছে—লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরিয়া যাহাকে পাইবার জন্য আকুল তৃষ্ণা ফুটিয়া উঠিয়াছে, আজ তা'র সম্মুখে সেই ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী তা'র মাতৃরূপে দণ্ডায়মানা!

শুধু সম্মুখে নহে; সম্মুখ ও পশ্চাৎ বলিয়া তখন কিছু ভেদ থাকে না—সম্মুখ কি পশ্চাৎ—ঊর্দ্ধ কি অধঃ—অভ্যন্তর কি বাহির, এ সব অনুভব তখন

থাকে না। নিজের অস্তিত্ব জীব তখন হারাইয়া ফেলে, থাকে শুধু সেই এক অন্বেষণের বস্তু বরাভয়করা—তা'র মা।

সাধক নতজানু হইয়া মাতৃচরণে লুন্ঠিত হইল, গদ-গদ কণ্ঠে কম্পিত অধরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিল,—

"অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতঙ্গময়।"

সাধকের জন্ম সফল হইল, নবারুণরাগে পূর্ব্ব দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—সাধকের সাধনা সিদ্ধ হইল।

কিন্তু সেই মহামুহূর্ত্তে সাধক যদি আপনাকে দেখিতে পাইত, তবে দেখিত তাহার মূর্ত্তি রজত-গিরি বৎ শুভ্র হইয়া গিয়াছে; জ্যোতির্ম্ময় জটা-জাল তাহার মস্তক হইতে পদতল অবধি বিস্তৃত, পূত মাতৃ-শক্তির মন্দাকিনী ধারা সেই জটাজালের অভ্যন্তরে প্রবাহিতা। অর্থাৎ তখন তাঁহার জীবত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে, সে শিব হইয়াছে!

তত্ত্ব সকল অনুপাত ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। সেই জন্য সাধনার এক একটী স্তর লইয়া আলোচনা করিতে হয় ও তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইলে উচ্চতর স্তর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইতে হয়। নতুবা জ্ঞান সঙ্করতা প্রাপ্ত হয় ও উর্দ্ধমুখী গতি প্রতিরোধ পাইয়া থাকে।

আর সাধক হইতে হইলে বা সাধনাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইলে অগ্রে জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া লইতে হয়। সাধারণ মনুষ্যজগৎকে লক্ষ্যহীন বাত্যাবিতাড়িত ধুলিপটলের মত অনুমিত হয়। লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন জীবন লইয়া ভারবাহি-গর্দ্দভের মত শুধু প্রবৃত্তির কশাঘাতে দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। এ সকল মনুষ্যনামীয় জীবশ্রেণী স্থিরলক্ষ্য বীরপুরুষদিগের অপেক্ষা বহু পশ্চাৎপদ। এরূপ অনেক লক্ষ্যহীন মনুষ্যকে সময়ে সময়ে সাধনা সম্বন্ধে অনুরাগ প্রকাশ করিতে, এবং মনুষ্য লোকে সাধক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের চঞ্চল প্রাণের লক্ষ্য কম্পিত করের

শরযোজনার মত, কতক্ অর্থে, কতক যশে কতক আত্মগরিমায় কতক বা পরোপকারের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে। তাহারা আত্মপ্রবঞ্চক। এক-প্রাণতা—একলক্ষ্য—জগতে অপ্রাপ্য না হইলেও সুদুর্লভ।

যাহা হউক, সাধনার পথে অগ্রবর্ত্তী হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য স্থির করা প্রয়োজন। ধনুর্মুক্ত শর বায়ু ভেদ করিয়া আপন লক্ষ্যস্থলে গিয়া যেমন মিলিত হয়—তদ্রূপ স্থিরলক্ষ্য পুরুষ ভগবচ্চরণে আশ্রয় পাইয়া থাকে। নতুবা লক্ষ্যের বক্রতা হিসাবে মনুষ্যকে বক্রপথে নীত হইতে হয়। যে অগণন মনুষ্যপুঞ্জ কর্ম্মবিশুষ্ক মুখে জগৎময় ছুটা-ছুটি করিতেছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিতে পারে না, কোন্ লক্ষ্যে তাহারা এমন অমূল্য জীবন ব্যয়িত করিতেছে।

কোন স্থলে একজন অসাধারণ যোগ-শক্তি-সম্পন্ন সাধু ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক কার্য্যা-বলী দেখিয়া অনেকে শিষ্য হইবার জন্য তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন; কিন্তু তিনি কাহাকেও

শিষ্য করিতেন না। দুইটী লোক এক সময়ে তাঁহাকে বিশেষ দৃঢ় ভাবে ধরিয়া বসিল ও দিবারাত্র তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহাদের এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া তিনি বলিলেন "বৎস! যদি একান্তই তোমরা আমার শিষ্যত্ব গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাক, তবে তোমাদের জীবনের লক্ষ্য সর্ব্বাগ্রে স্থির কর। নিজের চিত্তকে অনন্যগতিভাবে ভগবানের দিকে ফিরাইতে অভ্যাস কর।" তাহারা তদবধি সেই মহাপুরুষের সহিত অবস্থান করিতে লাগিল, এবং এইরূপে দুই বৎসর অতিবাহিত হইল।

ক্রমশঃ সেই শিষ্যদ্বয়ের চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। মহাপুরুষ দীক্ষা বা কোন প্রকার বিশেষ উপদেশ না দেওয়ায় তাহাদের চিত্তে ভাবান্তর ঘটিতে লাগিল। মহাপুরুষ স্বীয় যোগশক্তি বলে তাহা বুঝিতে পারিলেন ও তাহাদিগকে একদিন বলিলেন, "আজ রজনী দ্বিপ্রহরের সময় তোমাদিগের ভগবৎ সন্দর্শন ঘটিবে। তোমরা অনন্য চিত্তে ভগবদ্ধ্যানে নিযুক্ত থাক।"

ক্রমশঃ রজনী আসিল। গগনে তারকাপুঞ্জ দলে দলে ফুটিল, শিষ্যদ্বয়ের প্রাণে আশার জ্যোতিষ্কদল তদপেক্ষা অধিক ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; বর্দ্ধিতাগ্রহে তাহারা ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিল।

রজনী দ্বিপ্রহর! দৃশ্যমান জীবশূন্য সে গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া, মহাপুরুষ সাধকদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া নিকটস্থ একটি পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন, এবং আপনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া শিষ্যদ্বয়কে বলিলেন, যদি তোমাদের লক্ষ্য স্থির হইয়া থাকে, তবে আজ তোমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে। কিন্তু যদি স্থিরলক্ষ্য না হইয়া থাক, তবে তোমাদের এই দুই বৎসরের পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে বুঝিবে। আমার কোন দোষ নাই। আমার সম্মুখে উপবিষ্ট হও ও মুদিত নয়নে অপেক্ষা কর। সাবধান যতক্ষণ আদিষ্ট না হও, চক্ষু উন্মীলিত করিও না।

সেই কৃষ্ণান্ধকারমগ্ন পর্ব্বতশিখরে যোগাসনোপবিষ্ট সেই প্রশান্ত মহাপুরুষের সম্মুখে আশা ও

উৎকণ্ঠাপূর্ণ প্রাণে শিষ্যদ্বয় নয়ন মুদিত করিয়া উপবেশন করিল।

কিছুক্ষণ পরে সহসা সেই মহাপুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া উঠিলেন "যাহার লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস। ঐ দেখ তোমাদের সম্মুখে বিশ্বনাথের আনন্দ মন্দির!"

শিষ্যদ্বয় চাহিল—দেখিল সে পর্ব্বত দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এক ভাগের শিখরে তাহারা উপবিষ্ট। তারপর এক বিশাল বিস্তৃত গহ্বর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। গহ্বরের পরপারে পর্ব্বতের অপরাংশ অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্মণ্ডিত। সেই পর্ব্বতাংশের শিরে একটী অপূর্ব্ব হিরণ্ময় মন্দির। পূর্ণিমার চাঁদ দিয়া যেন সে মন্দিরটী গঠিত। আর সেই মন্দিরের চারিধার উদ্ভাসিত।

শিষ্যদ্বয় চক্ষুরুন্মীলিত করিবামাত্র, সেই মহাপুরুষ "ব্যোম্ বিশ্বনাথ", বলিয়া সেই বিস্তৃত গহ্বর অতিক্রম করিবার জন্য লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার সে ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দ দিগন্তকে প্রতিধ্বনিত

করিয়া তুলিল, মুহূর্ত্তমধ্যে শিষ্যদ্বয় দেখিল, সে মহাপুরুষ পরপারে মন্দিরের দ্বারদেশে পৌঁছিয়াছেন। মন্দিরের আলোক তাঁহার সে প্রশান্তবপু জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। যেন সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ মন্দিরের দ্বারে শিষ্যদ্বয়ের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

তাহারা এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইল—"জয় গুরু" "জয় গুরু" বলিয়া উত্তীর্ণ হইবার জন্য ছুটিয়া সে গহ্বরের নিকটস্থ হইল, কিন্তু সে বিশাল বিস্তীর্ণ অতল গহ্বর দেখিয়া হৃদয় দুলিয়া উঠিল—অন্তরাত্মা কাঁপিল! সম্মুখে বিস্তীর্ণ গহ্বর, গুরুদেব! কেমন করিয়া পার হইব? তাহারা মুখব্যাদন করিয়া সে গহ্বরের দিকে চাহিয়া রহিল।

মন্দির ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতে লাগিল—আলোকদীপ্তি ক্ষীণতর হইতে লাগিল—সে মহাপুরুষের মূর্ত্তি অস্ফুট হইয়া আসিল। তাঁহারা শুনিল, তিনি বলিতেছেন "তোমাদের লক্ষ্য স্থির হয় নাই।" এখনও প্রাণের দিকে লক্ষ্য রহিয়াছে, তাই গহ্বরের দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছে। স্থিরলক্ষ্য ধনুর্দ্ধরের নয়নে যেমন একমাত্র লক্ষ্যবস্তুর লক্ষ্য-

স্থান মাত্র প্রতিফলিত হয়, সাধকের লক্ষ্য তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক; নতুবা শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

"মনুষ্য অনেক সময়ে ভাবে, তাহার জীবনের লক্ষ্য বুঝি জগন্নাথের চরণ ছাড়া অন্য কোন দিকে নাই; কিন্তু সদ্গুরু কৃপায় লক্ষ প্রদানের সময় হইয়া আসিলে তাহারা বুঝিতে পারে, মায়ার গহ্বর এখনও তাহার সম্মুখে বিস্তৃত—মরীচিকার মোহ এখনও কাটে নাই। বিষয়, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় অথবা যশ, জ্ঞান বা প্রাণের দিকে তাহার লক্ষ্য তাহার অজ্ঞাতে ধাবিত। মনুষ্য হিরণ্ময়-কোষের সন্ধান পাইয়াও বঞ্চিত হয়।

"যাও—লক্ষ্য স্থির কর, লক্ষ্য স্থির কর—সদ্গুরু মিলিবে—বিশ্বনাথের হিরণ্ময় মন্দির প্রত্যক্ষীভূত হইবে"—"ব্যোম, বিশ্বনাথ" বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িও—চরণে নীত হইবে।

সব মিলাইয়া গেল।

শিষ্যদ্বয় ইহজন্মে আর সদ্গুরুর সন্ধান পাইয়াছিল কি না শুনি নাই!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনুভূতি ভেদ।

যাহা হউক, আপনার বিরাট গতিকে দ্রুততর করিয়া লইতে হইলে—স্বরাজ্যে অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য স্থির করা প্রয়োজন। আমাদিগের কর্ম্মমাত্রের লক্ষ্য যেন মাতৃ-চরণের দিকে স্থাপিত হয়। ধনুর্মুক্ত শর বায়ু ভেদ করিয়া যেমন লক্ষ্যস্থলে গিয়া পৌঁছায়, আমরা যদি সেই রাজরাজেশ্বরী জননীর দিকে লক্ষ্য ফিরাইয়া রাখিতে পারি, তবে অবিলম্বে তেমনই ভাবে তাঁহার চরণে গিয়া আশ্রয় পাইব। যে অগণন মনুষ্যপুঞ্জ কর্ম্ম-বিশুষ্ক মুখে জগৎময় ছুটাছুটি করিতেছে, তাঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনারা এই যে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে পরিশ্রম করিতেছেন, এই পরিশ্রমের লক্ষ্য কি? কিসের জন্য রণপ্রাঙ্গনে ক্ষত বিক্ষত হইতেছেন—কোন্

উদ্দেশ্যে আপনাদিগের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিতেছেন ? আপনি উত্তর পাইবেন—জানি না। তাই সংসার এত যন্ত্রণার আগার—তাই সংসারের নিশ্বাসে নিশ্বাসে মর্ম্মপীড়নের দীর্ঘ শ্বাস শুনিতে পাওয়া যায়। রণোন্মত্ত বীর ক্ষত বিক্ষত হইলেও যেমন তৎকালে সে উহার যন্ত্রণা অনুভব করে না, তদ্রূপ আমারও যদি জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে পারিতাম, তাহা হইলে যন্ত্রণা আর আমাদিগের যন্ত্রণা বলিয়া অনুভূত হইত না। লক্ষ্য স্থির হইলে একমাত্র লক্ষ্য পদার্থ ছাড়া আর কিছু অনুভূত হয় না।

লক্ষ্য স্থির করিব,—কিন্তু শিকারের বস্তু দেখিতে পাইলে, তবে শিকারী সেই দিকে লক্ষ্য স্থির করে। আমার সে লক্ষ্যের বস্তু কোথায় ? ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলে—জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করিতে পাইলে, তবে ত তাহাতে লক্ষ্য স্থির করিতে পারি। কোথায় আমার লক্ষের সে বস্তু—আমার সে তৃষিত চাতকের বিন্দুবারি—ক্ষুধার্ত্ত বৎসের ক্ষীরস্তন্যা জননী—সে সাগর সঞ্চারিণী তরণীর ধ্রুব

তারা কোথায় ? সে বিজ্ঞানবাদীর বিজ্ঞানঘন—চৈতন্যবাদীর চিদ্‌ঘন—বেদান্তবাদীর ব্রহ্ম—শূন্য-বাদীর মহাশূন্য কোথায় ? অথবা আমরা মূর্খ, আমরা আর কিছু জানি না—আমরা জ্ঞান হীন, বাল্যকাল হইতে শুধু মা বলিতে শিক্ষা করিয়াছি—আমরা মূর্খ মাতৃবাদী, আমাদিগের সে মা কোথায়, আশৈশব বিপদে পড়িলে—রোগে, শোকে, জ্বালা, যন্ত্রণায় যখনই কাতর হইয়া পড়ি, তখনই দীর্ঘ শ্বাসের সহিত আমরা মা মা বলিয়া থাকিতে পারি না। "মা" আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ বুলি, সে মা আমাদিগের কোথায় ? সে সর্ব্বব্যাপী অথচ অস্পৃশ্য—রূপময় অথচ অদৃশ্য—মহান্ অথচ পরমাণু তুল্য—কোথায় ? প্রাণ যাঁহার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহে—মন যাঁহার অঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িতে চাহে—ইন্দ্রিয়বর্গ যাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে চাহে আত্মা যাঁহাতে আপনার সত্ত্বা মিশাইয়া দিতে চাহে, সে কোথায় ? শুনিয়াছি, অথচ শুনিতে গিয়া আর শুনিতে পাই নাই—দেখিয়াছি অথচ চক্ষু ফিরাইতে গিয়া আর দেখিতে পাই নাই—বুঝিয়াছি অথচ

বুঝিতে গিয়া আর বুঝিতে পারি নাই—বুকের ভিতর অনুভব করিয়াছি অথচ ধরিতে গিয়া আর খুঁজিয়া পাই নাই—সে কোথায় ? সে আপনি ভালবাসে, আমায় ভালবাসিতে দেয় না—আপনি দেখে, আমায় দেখিতে দেয় না—আপনি স্নেহ করে, আমায় ভক্তি করিতে দেয় না—আপনি জড়াইয়া ধরে, আমায় স্পর্শ করিতে দেয় না—সে বিপদে আসে, সম্পদে পলাইয়া যায়—সে কোথায় ? অন্ধকারে ফুটিয়া উঠে আলোকে লুকাইয়া পড়ে, সে কোথায় ? নির্জ্জনে গুটি গুটি পা-টি বাড়ায়--লোক দেখিলেই পলাইয়া যায়--সে কোথায় ?

কেমন করিয়া তাহার সন্ধান করিব ? কোথায় জীবন প্রবাহ ঘুরাইয়া ধরিব ? কোন্ দিকে লক্ষ্য স্থাপন করিব ? কোন্ দিকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম-শর নিক্ষেপ করিব ?

আমি সাধনাকে অনুভূতি-ভেদি-বাণ বলি। শব্দ-ভেদি-বাণ যেমন শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছাড়িতে হয়, সাধনা-বাণ তদ্রূপ অনুভূতি লক্ষ্য করিয়া প্রক্ষেপ

করিতে হয়। শুনিয়াছি দশরথ শব্দ-ভেদী-বাণ শিক্ষা করিয়াছিলেন, শব্দ লক্ষ্য করিয়া সে বাণ ছাড়িলে, শব্দকারী তাহাতে বিদ্ধ হইত। আমা-দিগেরও অনুভূতি-ভেদী বাণ, তদ্রূপ অনুভূতি লক্ষ্য করিয়া ছুড়িতে হয়। আমাদিগের সে প্রাণের বস্তু সম্বন্ধে যখন যে দিক হইতে অনুভূতি বা ভাব প্রাণে জাগিবে, সেই দিক লক্ষ্য করিয়াই বাণ নিক্ষেপ কর—চরণে গিয়া বিদ্ধ হইবে। তাহাকে চরণে বিদ্ধ কর,—তাঁ'র চলচ্ছক্তি রোধ হইবে, আর পলাইতে পারিবে না। চন্দ্র যেন বাণবিদ্ধ হইয়া তোমার বুকের ভিতর খসিয়া পড়িবে—সে চঞ্চল পলাতক অচল প্রতিষ্ঠ হইবে।

ভাবই তাঁহার চরণ। ভাবে ভাবে তিনি চরণ প্রক্ষেপ করেন—ভাবে ভাবে তিনি অবতীর্ণ হয়েন—ভাবে ভাবে তাঁহার চরণ-নূপুর বাজিয়া উঠে। ভাবকে আমি তাঁহার চরণ বলিতেছি, ইহা কল্পনা নহে—বৈজ্ঞানিক সত্য। আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ-মাত্রেই জানেন, প্রত্যেক তত্ত্ব হইতে একটী করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং একটী করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রসূত

হয়। জগতের মূল উপাদান পাঁচটী তত্ত্ব—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্। প্রতি তত্ত্ব হইতে আমরা দুইটী করিয়া ইন্দ্রিয় পাই। ব্যোম্ তত্ত্ব গুণ যাহার শব্দ—তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রবণ, কর্ম্মেন্দ্রিয় কণ্ঠ; অর্থাৎ কর্ণ দিয়া আমরা শ্রবণ করি এবং কণ্ঠে শব্দ উচ্চারণ করি। এইরূপ বায়ুতত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় ত্বক, কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত; তেজতত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ম্মেন্দ্রিয় চরণ; অপতত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় জিহ্বা, কর্ম্মেন্দ্রিয় উপস্থ; ক্ষিতিতত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় নাসিকা ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পায়ু।

তেজতত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গুণ—রূপ, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গুণ—গতি বা বিকাশ; গতি প্রাপ্ত হওয়া, অবতীর্ণ হওয়া, বিকশিত হওয়া, বস্তুতঃ প্রায় একই জিনিষ। তবেই প্রাণে যখন ভগবদ্ভাব উদিত হয়—ভগবৎ-অনুভূতিতে প্রাণ যখন আলোকিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে ভগবদ্-গতি বা ভগবদবতারণা বা ভগবদ্-বিকাশ অথবা ভগবৎ-চরণ প্রক্ষেপ ঘটিয়াছে। ভগবদ্ভাবের কোমল পরশে প্রাণ যখন জুড়াইবে—বুঝিবে মা আমার কৈলাসাচলের,

সর্ব্বোচ্চ সত্যচূড়া হইতে হৃদয়ক্ষেত্রে বা মহর্লোকে রাঙা পা দুই খানি বাড়াইয়া দিয়াছেন। সেই ভাবকে লক্ষ্য করিবে—সেই চরণে লক্ষ্য করিবে—সেই অনুভূতি লক্ষ্য করিবে—সেই অনুভূতির দিকে তোমার জীবন গতি ঘুরাইয়া ধরিবে—সেই অনুভূতিকে প্রাণে ফুটাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে।

তুমি স্থির লক্ষ্য হইবে !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

-০-

স্তর বিভাগ।

যে অনুভূতির কথা বলিতেছিলাম, উহার বিভিন্ন স্তর আছে। সেইজন্য সাধনাও বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত; এবং পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্যস্থিরও ঐরূপ স্তরে স্তরে সাধিত হয়। বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মেরই কল্পনা বা অনুভূতি-প্রসূত বলিয়া, এবং তাঁহার অনুভূতিও স্তরে স্তরে বিভক্ত বলিয়া, ব্রহ্মাণ্ডও স্তরে স্তরে বিভক্ত। জীবানুভূতি বা সাধনাও সেইজন্য ঐরূপ স্তরে স্তরে বিভক্ত। সাধারণতঃ বিরাট ব্রহ্মাণ্ড বিশ্লেষিত করিলে উহাতে সাতটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দুইটী অপ্রশস্ত, পাঁচটী স্তর প্রসিদ্ধ। বেদান্ত ইহাদিগকে যথাক্রমে অন্নময়-কোষ, প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়-কোষ ও আনন্দময়কোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বেদের ভূঃ ভূবাদি সপ্ত লোক এই স্তর বিভাগ ; এবং সাধনার দ্বারা জীব ক্রমশঃ এই সপ্ত বা পঞ্চ স্তর অতিক্রম করে বলিয়া, সাধারণতঃ সাধনাও ঐরূপ স্তরে স্তরে বিভক্ত। যোগশাস্ত্রে ইহাদিগের নাম যথাক্রমে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। আবার সাম্প্রদায়িক হিসাবে ইহাই গাণপত্য, বৈষ্ণব, সৌর, শৈব ও শাক্ত নামে প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

অনেকে কথাটিকে সাম্প্রদায়িক ভাবে লইয়া মনে করিতে পারেন, এ সমস্ত বিভিন্ন দেবতার সাধনা, ইহাদিগের সহিত বিরাট স্তর বিভাগের সম্বন্ধ কিরূপে থাকিতে পারে বা একই সাধনার বিভিন্ন স্তর বলা কি প্রকারে যুক্তিসঙ্গত ! কিন্তু এই সকল দেবতাতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িক সাধনার মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিলে, ইহাদিগকে এক সাধনার বিভিন্ন স্তর বলিয়া সুন্দর রূপে প্রতীতি হয়। আমি বারান্তরে সে বিষয়ে আলোচনা করিব।

যাহা হউক, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুই সাধক। সাধনা—তাহাদিগের

বিরাটত্বের দিকে গতি। এই সাধনা আত্মার অনন্ত-জীবনব্যাপী। সাধনা-শূন্য জীবন হইতে পারে না—সাধনাশূন্য পদার্থের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যে মুহূর্ত্তে আত্মা সাধনাচ্যুত হইবে, সেই মুহূর্ত্তে সে নিজ অস্তিত্ব বিস্মৃত হইবে।

সাধনার যোগশাস্ত্রসঙ্গত যে আসনাদি স্তর গুলির কথা বলিয়াছি, ঐ স্তর বা বিভাগগুলিকে লোকে যেন শুধু এককালীন একটা ব্যষ্টি ব্যাপার বলিয়া মনে মনে ধারণা করে; অর্থাৎ একবার ঈশ্বর-সাধনা করিতে বসিলে, যে ক্রিয়াটুকু করিতে হয়, ঐগুলি যেন তাহারই স্তরবিভাগ।

কিন্তু অনন্ত জীবনব্যাপী যে সাধনা—জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া যে সাধনা করিয়া আসিতেছি এবং করিতে হইবে, এ সকল সেই বিরাট সাধনার—সেই বিরাট জীবনগতির স্তরবিভাগ। কত জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া কতবার জীবরূপে বিকশিত হইয়া—কতবার জন্ম মরণরূপ গণ্ডীর ভিতর দিয়া ছুটা-ছুটি করিয়া, তবে এক এক স্তরের সাধনার পরি-

সমাপ্তি ও উচ্চতর স্তরের সাধনা সূচিত হয়। অহং জ্ঞানের ঈষৎ উন্মেষণ হইতে সাধনা আরম্ভ হইয়াছে; সোঽহং জ্ঞানের পূর্ণ শক্তিময় বিকাশে সাধনা শেষ হইবে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, জীবরূপে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া প্রবৃত্তির চরিতার্থতা করিয়া মৃত্যুর কবলে পড়িতেছি—আবার জন্মাইতেছি—আবার আহার নিদ্রাদির দিকে চাহিয়া চাহিয়াই জীবনের শেষ হইতেছে—এইরূপে রাশি রাশি জন্ম-স্রোত চলিয়া যাইতেছে—ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধি কখনও বিকশিত হইল না—ঈশ্বর বলিয়া কোন কল্পনাই হয়ত প্রাণে কত জন্ম জাগে নাই—তবে সাধনা-স্রোত যে অপ্রতিহত ভাবে চলিতেছে—তবে যে আমি জন্ম জন্ম সাধনাই করিতেছি, কেমন করিয়া বলিব !

কিন্তু এইটুকু বুঝিতেই বহু জীবন অতীত হয়। এই জ্ঞানটুকুর উন্মেষণ হইতেই অনেক সময় লাগে। এই জ্ঞান যতক্ষণ না প্রাণে উজ্জীবিত হয়, যতদিন না—আত্মা নিজের অজ্ঞাতে সাধনা

করিতেছে—এইটুকু বুঝিতে পারে, ততদিন তাহার প্রথম স্তরের সাধনা চলিতেছে বুঝিতে হইবে। শিশু যেমণ মাতৃদুগ্ধ পান করে ও পুষ্ট হয়, অথচ জানেনা কেমন করিয়া পুষ্ট হইতেছে, এ অবস্থাও তদ্রূপ। ক্রমশঃ "জীবন বৃথা যাইতেছে" "ভগবৎ-স্মরণ হইতেছে না," "আহার, নিদ্রা, অর্থান্বেষণ প্রভৃতি ছাড়া আরও একটী কর্ত্তব্য আছে—উহা ঈশ্বর-সাধনা" ইত্যাদি আকারে আত্মার সাধনার দিকে লক্ষ্য পড়ে ও তখন সে সে সাধক—এই জ্ঞানের আলোক প্রাণে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। তখন হইতে সাধনার জন্য কাতরতা বাড়িতে থাকে ও সাধকের লক্ষণ সকল তাহার মানসিক ভাবে ও কার্য্যে বিকাশ পাইতে থাকে।

অর্থাৎ তখন তাহার দ্বিতীয় স্তরের সাধনা সূচিত হয়। এতদিন অজ্ঞাতে সাধনামাত্র চলিতে-ছিল, এখন জ্ঞানতঃ সাধনা করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে আসন, প্রাণায়ামাদি স্তরে স্তরে উঠিতে থাকে। যোগশাস্ত্র লিখিত উক্ত প্রকার স্তর-বিভাগ, ব্যষ্টিভাবে একবার চিত্তনিরোধ বা যোগস্থ

হইবার পক্ষেও যেমন, সমষ্টি জীবন প্রবাহের পক্ষেও তদ্রূপ। একদিনের একবারকার উদ্যমের পক্ষেও যেমন, তাহার লক্ষ লক্ষ জীবনমরণ একত্রে লইয়া যে একটা সমষ্টি গঠিত হয়, তাহার পক্ষেও তদ্রূপ।

আর একটা কথা। জীবাত্মা এই দ্বিতীয় স্তরের সাধনায় যতদিন না প্রবেশলাভ করে, ততদিন সাধনাকে যেন দৈহিক ও মানসিক কার্য্যাদি হইতে একটা স্বতন্ত্র জিনিষ বলিয়া মনে করে। আহার, নিদ্রা, অর্থচিন্তা ইত্যাদি যেমন দৃশ্যতঃ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যাপার, ঈশ্বরসাধনাও তদ্রূপ দৈনান্দন কার্য্যাদির সহিত সম্পর্কশূন্য একটা স্বাধীন বিভিন্ন ব্যপার—এইরূপ ধারণা থাকে। পাশ্চাত্য-দেশীয়েরা যেমন সপ্তাহে একদিন গির্জ্জায় গিয়া ধর্ম্মরূপ কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে ভাবে, ইহাও তদ্রূপ। জীবের এইরূপ জ্ঞান যতদিন থাকিবে, সাধনার সহিত জীবনের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কার্য্য হইতে মহৎ কার্য্যটী অবধি—একটি শ্বাস প্রশ্বাস হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুরূপ মহান্ 'পরিবর্ত্তনটি

অবধি—যতদিন না জড়াইতে পারিবে—যতদিন চক্ষের পলক প্রক্ষেপ হইতে কাম, ক্রোধ, লোভাদি প্রণোদিত বা ভক্তি, করুণা, স্নেহ, মায়াদি উদ্দীপিত বৃহৎ ঘটনাবলীকে সাধনার অঙ্গীভূত করিয়া লইতে সমর্থ হইবে, ততদিন বুঝিতে হইবে, তাহার দ্বিতীয় স্তরের সাধনা চলিতেছে।

প্রথম স্তরের শেষ যেমন সাধক হইবার বাসনা বা জ্ঞানতঃ সাধনার সূচনা; এই দ্বিতীয় স্তরের তদ্রূপ আপনার সত্বার সহিত বিরাট সত্বার সম্বন্ধ সংস্থাপন। প্রথম স্তরের সাধনা যম ও নিয়মরূপে প্রকটিত হয়, দ্বিতীয় স্তরের সাধনার নাম আসন-প্রতিষ্ঠা। আমরা এই দ্বিতীয় স্তরের বা আসন প্রতিষ্ঠার কথাই এইবার আলোচনা করিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিবহীন যজ্ঞ।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ ব্রহ্মাণ্ড সাধনা-মন্দির। ক্ষুদ্র ধূলিকণাটী হইতে হরি, হর, ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত সকলেই সাধক। কর্ম্মমাত্রের দ্বারাই আমরা মায়ের দিকে চলিয়াছি। কর্ম্মস্রোত আমাদিগকে বিরাট জননীতে সংযুক্ত করিবার জন্য লইয়া চলিয়াছে। একদিন সুদূর ভবিষ্যতের এক সৌরকরোজ্জ্বল নির্ম্মল প্রভাতে আমরা বিশ্বব্যাপিনী জননীর অঙ্গে মিশাইয়া অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইব। একদিন আমারই অঙ্গ বেষ্টন করিয়া সূর্য্য চন্দ্রাদি অনন্ত কোটী গ্রহ উপগ্রহাদি ভক্তি-ভরে আমাকে প্রদক্ষিণ করিবে। আমরাই অনন্ত ঐশ্বর্য্য গান করিতে করিতে সিদ্ধর্ষিমণ্ডলীর স্তোত্র-গীতি তালে তালে দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া স্পন্দনে

স্পন্দনে কত নূতন ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন করিবে—আমারই অঙ্গের জ্যোতিবিন্দু পাইয়া কত দেবতা মৃত্যুঞ্জয় হইবে—আমারই নয়ন ইঙ্গিতে বিশাল বিশ্ব-সমুদ্র ফুটিবে—থাকিবে—মিলাইয়া যাইবে। আমারই শ্বাস প্রশ্বাসে পবন প্রবাহিত হইবে—আমারই সৌন্দর্য্যে স্থষ্টিচক্র সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইবে—আমারইগন্ধে পাদপশিরে কুসুমসম্ভার সুগন্ধময় হইয়া উঠিবে। রাজরাজেশ্বরের বরপুত্র আমি, একদিন রাজরাজেশ্বর হইয়া যোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইব। আমার অনন্ত জীবনের কর্ম্মপ্রবাহ আমাকে সেই দিকে লইয়া চলিয়াছে !

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি কর্ম্মমাত্রেই সাধনা। প্রত্যেকেই আমরা সাধকপদবাচ্য, আমাদিগের প্রতি কর্ম্মের ভিতর শাস্ত্রোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগ সন্নিবেশিত। একটী ক্ষুদ্র কার্য্য বিশ্লেষিত করিয়া দেখিলে, তাহার মধ্যে আমরা যোগের পূর্ব্বোক্ত স্তরগুলি দেখিতে পাই। আমাদিগের জীবনপ্রবাহ আমাদিগের অনন্ত জীবনসমষ্টি একত্রে সমালোচনা করিলে, উহাতে যেমন যোগাঙ্গগুলি পরিদৃষ্ট হয়—

বিরাট ব্রহ্মাণ্ড বিভক্ত করিয়া দেখিলে তন্মধ্যে যেমন ঐ স্তরসকল দেখিতে পাওয়া যায়—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কার্য্য লইয়া দেখিলে, আমরা ঐরূপ স্তর-বিভাগ বা যোগাঙ্গ সকল তাহার ভিতর তদ্রূপ দেখিতে পাই। এক একটী করিয়া সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

মনে করুন আসন। প্রত্যেক কার্য্য করিবার সময় তদুপযুক্ত ভাবে যে অঙ্গবিন্যাস করিতে হয়, তাহাই সেই কর্ম্মের আসন। লিখিতে, পড়িতে, আহার করিতে, দৌড়াইতে, কথা কহিতে, ভিন্ন, ভিন্ন প্রকারে আসন বা অঙ্গবিন্যাস স্বভাবসিদ্ধ। দৌড়াইবার মত অঙ্গভঙ্গি করিয়া নিদ্রা যাইতে বা বৃক্ষারোহণের মত অঙ্গবিন্যাস করিয়া আহার করিতে অবশ্য দেখা যায় না। তবে ইদানিন্তন পাশ্চাত্য অভ্যাস বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইতে পারে, তাহাতে এইরূপ প্রত্যেক কর্ম্মের সর্ব্বতো-ভাবে উপযুক্ত আসনে মানবোচিত এখনও অভাব আছে; এবং তদনুকরণে আমরাও মানবস্বভাব-সুলভ কর্ম্মসকলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনপ্রণালী

ভুলিতে শিক্ষা করিতেছি ; কিন্তু উহা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

যাহা হউক, তারপর প্রাণায়াম। কোন কার্য্য করিতে তদুপযুক্তভাবে প্রাণশক্তি কেন্দ্রস্থ করার নাম প্রণায়াম। দ্রুত যাইতে, পাঠ করিতে, চিন্তা করিতে, আমার শ্বাসাদি প্রাণক্রিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন রূপে স্বভাবতঃ অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই তত্তৎ কর্ম্মের প্রণায়াম।

প্রত্যাহার—চারিদিক হইতে মনঃশক্তি গুটাইয়া লইয়া এক বিষয়ে স্থাপিত করিবার চেষ্টার নাম প্রত্যাহার। ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, মনের অন্ততঃ এ আংশিক প্রত্যাহারও কার্য্যবিশেষের উপর প্রক্ষিপ্ত না হইলে কার্য্য হইতেই পারে না। আমাদিগের দেহের শ্বাসক্রিয়া, স্বতঃক্রিয়াশীল পেশী, স্নায়ু ও পরমাণুসকলের ক্রিয়া যদিও স্বাভাবিকরূপে পরিণত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাদিগের উপর আমাদিগের মনের দৃষ্টি আছে বুঝিতে হইবে। কেন না সমাধি হইলে ঐ সমস্ত ক্রিয়াই রোধ হইয়া যায় ; এবং ইহা ব্যতিত অনেক

যোগীকে ঐচ্ছিক পেশীসকলের মত ঐ সকল পেশী ও যন্ত্রকে ইচ্ছাধীন করিয়া লইতে সক্ষম হইতে শুনা গিয়াছে।

এইরূপ ধ্যান, ধারণা ও সমাধি আদি অঙ্গ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক কার্য্য করিবার সময় আমরা আংশিকভাবে তদ্বিষয়ের উপর সমাধিস্থ না হইলে সে ক্রিয়া সংসাধিত হয় না, ইহা বৈজ্ঞানিক যুক্তিসাপেক্ষ। এইরূপে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় কোন একটী কার্য্য করিতে হইলে তাহার ভিতর পর পর যোগের এই অষ্টাঙ্গ সংসাধিত হইয়া থাকে।

তবেই প্রত্যেক কার্য্যের ভিতর আমরা যোগের প্রত্যেক অঙ্গই অল্প বিস্তর মাত্রায় দেখিতে পাই। অথচ গৌণভাবে কার্য্য সকল আমাদিগের বিরাট গতির পোষক হইলেও মুখ্যভাবে আমরা এই কার্য্য গুলি অশান্তি, বন্ধন ও ধ্বংসের কারণ বলিয়া দেখি কেন ? আমরা কর্ম্মের দ্বারা বার বার মরণের রোলে পড়িতেছি কেন ? আমাদিগের দৈনন্দিন কার্য্যসকল আপাতঃ শান্তিপ্রদ না হইয়া অশান্তির

প্রস্রবণরূপে আমাদিগকে জর্জ্জরিত করে কেন? আমরা সেই কর্ম্মসকলই করিতেছি—আমরা অহর্নিশ কর্ম্মরূপযজ্ঞ নিষ্পন্ন করিতেছি—যজ্ঞের সমস্ত অঙ্গই প্রায় যথারীতি সম্পন্ন হইতেছে। অথচ এই যজ্ঞে আমরা অমৃতের আস্বাদ না পাইয়া বিষদগ্ধ যন্ত্রণা অনুভব করি কেন? আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাস হইতে আরম্ভ করিয়া সংসাররূপ বিশ্বপালন অবধি মহাকর্ম্মসকল প্রতিনিয়ত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অবস্থানুক্রমে নির্ব্বাহ করিতেছি; অথচ অশান্তির প্রবল ঝঞ্ঝাবাত হৃদয়ে শান্তির লতিকাকুঞ্জকে উন্মূলিত করিয়া ফেলিতে দেখি কেন?

তাহার কারণ আমরা শিবহীন যজ্ঞ করি। আমাদিগের যজ্ঞ গৌণতঃ যাহাই হউক, মুখ্যভাবে দক্ষযজ্ঞরূপে সম্পন্ন হয়। যজ্ঞে আমরা সমস্তই করি। জ্ঞানরূপ ব্রাহ্মণ যজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণ করেন—প্রাণরূপ হবিঃ আহুতিরূপে অর্পিত হয়—ইন্দ্রিয়-রূপী দেবতাবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া সে যজ্ঞের স্ব স্ব ভাগ গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করেন—দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দেবতাই সে যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়েন;

শুধু জগদ্‌গুরুরূপী, মহাযোগী আত্মা তাহাতে আহুত হয়েন না।

দক্ষের এই শিবহীন যজ্ঞ আমরা জগতের চারিধারে অহর্নিশ সংসাধিত হইতে দেখিতে পাই। আমরা প্রত্যেকই জীবত্বের অহংকারে দক্ষপ্রজাপতিরূপে অভিমানবদ্ধ। আমাদিগের প্রত্যেক কর্ম্মরূপ যজ্ঞে ইন্দ্রিয়াদি দেবতাবর্গ যজ্ঞভাগরূপ অমৃত পাইবার জন্য লালায়িত; কিন্তু কর্ম্ম করিবার সময় আমরা জগদ্‌গুরু আত্মার আমন্ত্রণ করি না। বহির্জগতের সর্ব্বত্র আমাদিগের নিমন্ত্রণ সংবাদ প্রেরিত হয়, কিন্তু অন্তর্মুখকে আমরা প্রতিকর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া থাকি। যাঁহার অস্তিত্বে আমাদিগের অস্তিত্ব—যাঁহার যোগচ্যুতিতে আমরা প্রলয়রূপ মৃত্যুর কবলে পতিত হই—ব্রহ্মশক্তিরূপিণী মা আমার যাঁহার হৃদ্‌বিহারিণী, তাঁহার দিকে দম্ভভরে চাহিয়াও দেখি না। আমরা আপাতঃ মধুর ইন্দ্রিয়াদিসুখপ্রদ দেবতাসকলকে আবাহন করিয়াই ও তাহাদিগের আদর আপ্যায়নেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি, কিন্তু আমাদিগের নিত্য শিব—

নিত্য মঙ্গল, মঙ্গলময়ী জননীর নিত্য অধিষ্ঠান ক্ষেত্র —নিত্য আধার—নিত্য অস্তিত্ব—মাতৃশক্তির নিত্য অধিকারী—আত্মার দিকে বারেকের তরেও ফিরিয়া চাহি না।

মা আসেন, থাকিতে পারেন না। কর্ম্মময়ী মা আমার—ভুবনে ভুবনে যাঁহার কর্ম্মই স্বরূপ—ভুবনে ভুবনে যিনি কর্ম্মরূপেই প্রতিষ্ঠিত—অনন্ত-কোটী বিশ্বভুবন যাঁহার কর্ম্মের স্ফুলিঙ্গপুঞ্জ, তিনি কর্ম্মে না আসিয়া থাকিবেন কি প্রকারে! প্রতি কর্ম্মের দশদিক ব্যাপিয়া যিনি দশমহাবিদ্যারূপে অধিষ্ঠিতা, তিনি কর্ম্মে না আসিয়া কেমন করিয়া থাকিতে পারেন ?

মা আসেন—রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা মা আমার আসেন; কিন্তু অনাথিনী বেশে। কোটী সূর্য্যকিরীটোজ্জ্বল কৈলাস যাঁহার চরণজ্যোতিতে উল্লাসিত—কোটী সূর্য্য চন্দ্র, যাঁহার অঙ্গ সঞ্চালনে লাবণ্যরঙ্গরূপে ফুটিয়া উঠে—কোটী ব্রহ্মা বিষ্ণু, হর, হরি যাঁহার রক্তচরণে পাদ্য দিবার জন্য করপুটে দণ্ডায়মান, সেই মা আমার আসেন; কিন্তু অনাথিনী

বেশে ! অনিমন্ত্রিতা—অনাহূতা,—উপেক্ষিতা—সন্তানের স্নেহাদরে বঞ্চিতা হইয়াও, তবু যেন স্নেহাভিমানের অশ্রুবিন্দু আঁখির কোণে লুকাইয়া—অনাদরের গৈরিক বসন পরিধান করিয়া—উপেক্ষার জটাজালে শিরোপৃষ্ঠ লুক্কায়িত করিয়া—গৌরবের রত্নরাজি দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভীতা—সঙ্কুচিতা—আপনার মা পরের মত হইয়া ধীরে ধীরে আমাদের যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। সিংহবাহিনী পশুপতির হৃদয় অন্ধকার করিয়া প্রভাতের প্রদীপের মত ম্লান মুখে আসেন। যেখানে মূঢ় দক্ষ যজ্ঞরূপে মাতৃপ্রতিষ্ঠা করিয়াও কন্যারূপে উপেক্ষা করে, সমস্ত দেবতারূপে তাঁহারই আবাহন করিয়া কৈলাসেশ্বরীরূপে তাঁহাকে অনাদর করে—যেখানে বহির্মুখে তাঁহারই পূজা করিতে গিয়া অন্তর্মুখে তাঁহারই অবমাননা করে—সেখানেও মা আসেন ; ধীরে ধীরে যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করেন—আনত নয়নে, কর্ম্মের আশ্রয়দাতা বা কর্ত্তা বলিয়া সেই সূত্রে পিতৃস্থানীয় দাম্ভিক কর্ম্মীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান ; যাঁহার চরণপরশ সর্ব্বভীতি-

নাশক—সর্ব্ববরপ্রদ, তিনিই বরাভয় কর দুখানি বাড়াইয়া, অনাদর, আহ্বান উপেক্ষা করিয়া স্নেহ-পীড়িত বক্ষের কবাট উন্মোচন করিয়া দিয়া—বুঝি সোহাগের আশায়—বুঝি আদরের লোভে—বুঝি মাতৃ-ধর্ম্মের প্ররোচনায় আসিয়া দাঁড়ান। কর্ম্মীর প্রাণের ভাব কর্ণে শ্রবণ করিবার জন্য কানটী বাড়াইয়া—কর্ম্মীর হৃদয়ের ছবি মুখে ফুটিয়া উঠিতে দেখিবার জন্য নয়ন ঈষৎ উন্মিলিত করিয়া মা আসিয়া দাঁড়ান। কিন্তু কই! কে তাঁহার দিকে লক্ষ্য করে! গর্ব্বী কর্ম্মোন্মত্ত জীব সে দিকে চাহে না—যদিও চাহে, সে চাহনি শিব-নিন্দায় পূর্ণ—সে মুখের প্রতি শিরায় শিবনিন্দা প্রবাহিত—সে যজ্ঞের প্রতি ধূলিকণায় শিবনিন্দা উদ্গারিত—সে যজ্ঞের প্রতি মন্ত্রে শিবনিন্দা মুখরিত। গুণের গৌরবে যে যজ্ঞস্থলে নিগুর্ণত্ব পদদলিত—অহংজ্ঞানের আস্পদে "স্বঃ" সেথায় দূরীকৃত। সেথায় কি মা থাকিতে পারেন? যোগেশ্বরীর আসন সেথায় নাই—মূল সেথায় খণ্ডিত; সেথা কি মায়ের বসিবার স্থান হয়? হোমশিখা সেথা

রাজসিক দুর্গন্ধে পরিবৃত, হোমাগ্নি সেথায় তামসিক ভস্মে আবৃত—সেথা কি মা থাকিতে পারেন ? শিব-হীন যজ্ঞ—শিব নাই !—মঙ্গল নাই !—মঙ্গলময়ীর প্রতিষ্ঠা কিরূপে হইবে ? মা নির্জীবিতা হইয়া দেহত্যাগ করেন !

কৈলাসপুরী কাঁপিয়া উঠে—সহস্রদলমধ্যস্থ কৈলাস দল্ দল্ দুলিয়া উঠে। ঘোর তমঃ ভূত প্রেতাদিরূপে যজ্ঞস্থলে অবতীর্ণ হয়। দেবন্যবর্গ চারিধারে পলাইয়া যায়। তমোগুণের অত্যাচারে যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হয়—দক্ষের মুণ্ড ছাগমুণ্ডে পরিণত হয় ; শুধু তামসিকতার কর্কশ, অসার ছাগচীৎকারে যজ্ঞকারীর মুখী নিযুক্ত থাকে।

এইরূপে আমরা যজ্ঞ করিতেছি। আমাদিগের প্রতি কর্ম্ম এইরূপে সম্পাদিত হইতেছে। অন্তর্লক্ষ্য না থাকায়—কর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য উপেক্ষা করায়, আমরা কর্ম্ম করিয়াও মাতৃ-পীড়ক ও ছাগমুণ্ডী হইয়া যাইতেছি। আমরা কর্ম্ম করিতেছি, কিন্তু যিনি কর্ম্মস্বরূপিনী—যিনি কর্ম্মের সিদ্ধিস্বরূপা, তাঁহার আসনস্বরূপ জগদ্গুরুকে আমরা কোন

কর্ম্মেই আবাহন করি নাই। বরং অহংজ্ঞান মুগ্ধ হইয়া আত্মকর্তৃত্ব দর্শন করিয়া পদে পদে তাঁহার উপেক্ষা করিয়া থাকি—তাঁহার জগৎ-কর্তৃত্ব কাড়িয়া লইতে প্রয়াস পাই। মুখ্য ফল তাঁহার বার বার মৃত্যু, ও ছাগমুণ্ড লাভ। অসার ভাব-স্তূপে অহর্নিশ বিকৃত মুখ হইয়া ছাগমুণ্ড দক্ষ সাজিয়া বসি।

তাই আমাদিগের কার্য্যসকলে আমরা অমৃত উপভোগ করিতে পাই না—তাই আমরা কর্ম্মে কর্ম্মে সিদ্ধির অমৃত ভোগ করিতে পাই না—তাই কর্ম্মে আনন্দের উৎস ছুটিতে দেখিতে পাই না। এই শিবশূন্যতাই আমাদিগের দ্বিতীয় স্তরের সাধক হইবার পক্ষে অন্তরায়।

হায় মনুষ্য! কর্ম্মের সমস্তই তুমি কর, শুধু শিবকে উপেক্ষা করিয়া বস, এই তোমার দোষ। কর্ম্মে কর্ম্মে শিবের আমন্ত্রণ করিতে শিক্ষা কর, প্রত্যেকেই বুদ্ধ, চৈতন্য হইতে পারিবে। তোমায় পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না—তোমরা প্রত্যেকেই রাজরাজেশ্বরীর বরপুত্র—তোমাদিগের প্রত্যেকের

হৃদয়েই অনন্ত শক্তি—অনন্ত জ্ঞান, খনিমধ্যে হীরকের মত সংরক্ষিত—তোমরা পিতৃ-অবমাননা করিয়া মাতৃ-মৃত্যুর কারণ হইও না। তোমরা বারাণসী, কামরূপ, জ্বলামুখী, ত্রিপুরা, কুরুক্ষেত্র, কন্যাশ্রম, বৃন্দাবন, হিঙ্গলা আদি তীর্থ স্থান দেখিতে যাও, শুধু, তীর্থ দেখিয়া পুণ্য সঞ্চয় হইল বলিয়া ফিরিয়া আইস; কিন্তু অনাদৃতা জননীর শিব-নিন্দায় দেহত্যাগের কথা ভাবিয়া অশ্রুবিন্দু ঢালিয়াছ কি ?

শুন! তোমার পদনখর হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি ব্যাপিয়া বিষ্ণুমায়ায় ছেদিত মাতৃ-দেহ বিস্তৃত রহিয়াছে। প্রাণ অভাবে মৃতদেহাঙ্গ মাত্র রূপে মাতৃ-অঙ্গ বিস্তৃত। কৈলাসের শিরোপরে জগদ্-গুরু সতী অভাবে সমাধিমগ্ন। তুমি তীর্থে তীর্থে —অঙ্গে অঙ্গে কাঁদ। পদাঙ্গুলি হইতে মস্তিষ্কাবধি প্রতি অঙ্গে ছিন্ন মাতৃ-শক্তির লীলা দেখিতে পাইতেছ সত্য; কিন্তু সেই লীলা দেখিয়া অভি-মানিনী—পূর্ণা জননী কোথায় লুকাইয়া আছে—দেহস্থ কোন তীর্থে অভিমান করিয়া বসিয়া আছে,

তাহার সন্ধান কর—আঁহারে মাথায় করিয়া কৈলাসে লইয়া যাইতে শক্তি অন্বেষণ কর। সমস্ত তীর্থ এক হইয়া যাইবে—মায়ের বিচ্ছিন্ন অংশ যুক্ত হইবে—প্রতি অঙ্গে অঙ্গে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তির যে বিকাশ দেখিতে পাও, ঐ সমস্ত একীভূতা হইয়া মাতৃশক্তি বলিয়া চিনিতে পারিবে—এ দেহ মায়ের হইয়া যাইবে—তোমার দেহ অর্দ্ধ নারীশ্বরের অপূর্ব্ব দেহে পরিণত হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আসন তত্ত্ব।

আমরা এ পর্য্যন্ত আলোচনা করিলাম যে, যত দিন না ভগবানের দিকে লক্ষ্য পড়ে এবং আপনাকে সাধক বলিয়া পরিচিত হয়, ততদিন প্রথম স্তরের সাধনা চলিতেছে বুঝিতে হয়। আর বলিয়াছি, আমাদিগের সমষ্টি জীবনব্যাপী সাধনার এই প্রথম স্তর যোগশাস্ত্রোক্ত যম নিয়ম নামক যোগাঙ্গ মাত্র। দ্বিতীয় স্তরের সাধনা যোগশাস্ত্রোক্ত আসন তত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আপনাকে সাধক বলিয়া পরিচিত হওয়া দ্বিতীয় স্তরের সাধনার সূচনা। কর্ম্মসকল, ইতি-পূর্ব্বে যাহা প্রথম স্তরে গৌণভাবে সাধনাপদবাচ্য হইলেও দক্ষযজ্ঞবৎ মুখ্যভাবে আপাতঃ মৃত্যুজ্বালা যন্ত্রণাময়ীরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছিল, এই দ্বিতীয় স্তরে

অন্তর্লক্ষ্য হওয়ায় এবং প্রতি কর্ম্মই আমাদিগকে শিবময় শিবত্বের দিকে লইয়া যাইতেছে, এইরূপ জ্ঞান হওয়ায়, উহা মুখ্য ও গৌণ উভয় ভাবেই মঙ্গলপ্রদ হইয়া উঠে।

প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াদি প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদস্তু তব পূজনম্॥

এই জ্ঞান এই দ্বিতীয় স্তরেই বার বার হৃদয়ের ভিতর ঝঙ্কার করিয়া উঠে; এবং এই অবস্থাতেই আপনাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে না দিয়া জীব প্রতিষ্ঠিত হইবার অবসর পায়। এই অবস্থায় সাধক যেন সমুদ্র মধ্যে পর্ব্বতের মত ধীরে ধীরে অচল প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িয়া থাকে। এই জন্যই ইহা অনন্ত জীবনব্যাপী সাধনার আসন নামক দ্বিতীয় স্তর বলিয়া অভিহিত।

এই অবস্থাতেই জীব শিবের আবাহন করে—এই অবস্থাতেই জীব আপনাকে শিব বলিয়া অনুভব করাতে শিবত্বের উপলব্ধি করে; এবং সেই পরিমাণে ব্রহ্মশক্তির আভাস পাইতে থাকে।

ব্রহ্মশক্তির বিমল জ্যোতিতরঙ্গ এই অবস্থাতেই সাধকের প্রাণে স্ফুরিত হয়।

শিবই ব্রহ্মশক্তির প্রশস্ত লীলাভূমি। যেমন সৌরকররাশি দর্পণাদি স্বচ্ছ পদার্থেই সম্যক প্রতিফলিত হয়; আবার প্রতিফলিত করিবার কোন বস্তু না থাকিলে যেমন সে জ্যোতিরাশি অবাধে চক্ষুর অগোচরে চলিয়া যায়, তদ্রূপ জীবহৃদয়ই ব্রহ্মশক্তি প্রতিফলিত করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র। জীবহৃদয় যত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হইবে, ব্রহ্মজ্যোতিঃ তাহাতেই তত সুন্দররূপে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকিবে। আমরা "মা আমার কাল কেন ?" নামক পুস্তিকায় বুঝিয়াছি, এক বিরাট রজতগিরিবৎ শুভ্রাঙ্গ মহান্ দেবতা আছেন, যাঁহাতে সমস্ত বর্ণরঞ্জনা প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে; ঐরূপে বর্ণসকলকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন বলিয়াই তাঁহার বর্ণ শুভ্র। আর বলিয়াছি, ব্যোম্ ও বায়ু ব্যতিত বহির্জগতের সমস্ত পদার্থের যেমন বর্ণ আছে, অন্তর্জগতেও তদ্রূপ। প্রায় সমস্ত ভাবরাশিই তদ্রূপ বর্ণবিশিষ্ট। অন্তরে কোন ভাব

উদয় হইলেই বুঝিতে হইবে, আমাদিগেরই হৃদয়ে ঐ সকল ভাবের ছবি প্রতিবিম্বিত হইতেছে মাত্র। যদি আমাদিগের হৃদয় শুভ্রত্ব লাভ করিত, তাহা হইলে জগতের ভাবসকল আমাদিগের অন্তরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইত না। শুভ্রবর্ণ যেমন অন্যান্য বর্ণকে প্রত্যাখ্যান করে, আমাদিগের হৃদয়ও শুভ্র হইলে তদ্রূপ জগতের ভাবসকলকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইত। আমরা যত আমাদিগের হৃদয়কে স্বচ্ছ ও শুভ্র করিতে সমর্থ হই, তত আমরা শিবত্ব লাভ করিতেছি বুঝিতে হইবে; এবং ততই ব্রহ্মশক্তি উহাতে প্রতিফলিত হইবার অবসর পাইবে। ব্রহ্মশক্তি জগৎ ব্যাপিয়া অবাধে বহিয়া চলিয়াছে। যেখানে প্রতিফলিত হইবার সুযোগ পায়, সেইখানে বাধা প্রাপ্ত হয় বা স্বরূপে ফুটিয়া উঠে।

যাহা হউক, এই যে শুভ্রত্ব, ইহা কি ? সর্ব্ব বর্ণের উপাদান শুভ্রবর্ণে সন্নিবেশিত; অর্থাৎ শুভ্রবর্ণে সকল বর্ণই আছে, অথচ কোনটাই প্রবলরূপে ক্রিয়াশীল নহে। সকল গুলিই গুণের

অনুপাতানুসারে সমানভাবে অবস্থিত। এই গুণের সমতাই শুভ্রত্বের প্রকৃত কারণ। আমরা যত সমদর্শী হইতে পারিব—আমাদের হৃদয়ের সমস্ত গুণকে যতই সমতার সমতল ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিতে পারিব, হৃদয় ততই শুভ্র হইতে থাকিবে এবং ততই উহা ব্রহ্মশক্তির লীলাভূমি হইয়া উঠিবে।

বলিয়াছি, ব্রহ্মশক্তি বর্ণহীনা, অথবা সকল বর্ণ এমনই ভাবে সজ্জিত যে, কোনটীই ক্রিয়াশীল নহে। ঐ বর্ণহীনতাই কৃষ্ণরূপে বর্ণিত। আবার শুভ্রবর্ণে সকল বর্ণই সমতা হিসাবে ক্রিয়াশীল ; অর্থাৎ সকলগুলি সমষ্টিভাবে শুভ্রস্বরূপ একটী অপর বর্ণানুভূতি রচনা করে। শুভ্র বর্ণে সকল বর্ণ আছে, অথচ সকলের বিভিন্ন বিভিন্ন ক্রিয়া নাই ; যেন দলবদ্ধ হইয়া শুভ্রত্ব প্রকাশরূপ একটী মাত্র ক্রিয়া প্রকটিত করিতেছে। কৃষ্ণ বর্ণে বা বর্ণ-হীনতাতেও সকল বর্ণ আছে, অথচ কোনটীই কোন প্রকারে ক্রিয়াশীল নহে ; বর্ণহীন ও শুভ্র বর্ণে এই প্রভেদ।

যাহা যত কৃষ্ণ, তাহা ততই শুভ্র পদার্থে প্রতিবিম্বিত হইবার যোগ্য। এ সকল কথা আমরা বর্ণ বিজ্ঞানে উত্তমরূপে বুঝিয়াছি, সুতরাং নির্গুণা ব্রহ্মশক্তি উত্তমরূপে প্রতিবিম্বিত করিতে হইলে, বিচিত্র বর্ণশালী ভাবরঞ্জনাসকলকে এক সমান লক্ষ্যে কার্য্যকারী করিলে অথবা আমাদিগের বহুবর্ণবিশিষ্ট সগুণ অবস্থাকে একমুখী ও এক গুণ বা এক বর্ণীয় করিয়া তুলিতে হইবে। নির্গুণ বা বর্ণ হীনা একই কথা। সমদর্শন বা শুভ্রবর্ণ একই কথা। সমদর্শনই সগুণতার চরম বিকাশ।

এইরূপে আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হই যে, ভাববর্ণহীনা নিরুপাধি অবস্থার যদি কোথাও প্রতিবিম্বপাত সম্ভব হয়, তাহা হইলে উহা ভাববর্ণসকল যেখানে একমুখী হইয়া এক ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে—যেখানে বিবিধ ভাব সকল স্ব স্ব বর্ণরঞ্জনা হারাইয়া এক নূতন সর্ব্ব বর্ণ প্রত্যাখ্যানকারী শুভ্রবর্ণত্ব বা স্বচ্ছত্ব লাভ করিয়াছে, সেইখানেই সম্ভব। "মা আমার কাল' কেন?" নামক পুস্তিকায় নির্গুণত্বকে কেন.

আমাদিগের শাস্ত্র কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন ; অথবা জীব কূটস্থ হইয়া জ্যোতির্ম্ময় অথচ কৃষ্ণ কান্তির স্থির, স্নিগ্ধ, নিত্য এক অভূত-পূর্ব্ব ভাবামৃতের আস্বাদন কেন পায় ; এবং সে ভাব স্নিগ্ধ ছায়ার মত কৃষ্ণবর্ণ-ধর্ম্মাবলম্বী কেন, বা সে তুরীয় অবস্থার ছায়াতলের সহিত বাহ্যতঃ কতকটা সাদৃশ্য আছে কেন, ইহা আমরা বুঝাই-য়াছি। আমরা বুঝাইয়াছি, একমাত্র কৃষ্ণবর্ণের সহিতই তাহার বাহ্য সাদৃশ্য প্রত্যক্ষগোচর হয়। আমরা নিগুর্ণতত্ত্বটীকে সাধারণ বাহ্য হিসাবে দেখিলে বা তুরীয় অবস্থার অনুভূতির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, এবং বুঝাইতে গেলে কৃষ্ণবর্ণীয় না বলিয়া থাকিতে পারি না। তাই ব্রহ্মময়ীকে কাল' রূপে অনুভূত হয়। ইহা বিষদভাবে বুঝান হইয়াছে।

উপস্থিত প্রবন্ধে আমরা এই বুঝিলাম যে, সেই নিগুর্ণতত্ব যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে— সেই শ্যামকান্তি অনুভূতিযোগ্য হইয়া ফুটিয়া উঠিতে হইলে, বর্ণতত্ত্ব হিসাবে যদি কোথাও শুভ্র, স্বচ্ছ

প্রতিবিম্বগ্রহণসক্ষম স্থান থাকে, তবে সেইখানেই অনুভূত হইবে। আর সে স্বচ্ছত্ব এত অধিক মাত্রায় হওয়া চাই, উহা যেন নীলিমাগর্ভে প্রায় প্রবিষ্ট হইবার উপক্রম করিয়াছে। অর্থাৎ বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট গুণসকল এত ক্ষীণভাবে সেখানে ব্যক্ত, যেন উহাঁদের অস্তিত্ব শুভ্ররূপে পরিবর্তিত হইয়াও তাহাও যেন হারাইয়া ফেলিয়া নিগুর্ণত্বে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছে—নীলিমা বা কৃষ্ণবর্ণের উপকণ্ঠে গলা বাড়াইয়া দিয়াছে! এইরূপ ধরণের শুভ্র হইলেই তবে সেথায় নিগুর্ণত্বের যথার্থ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইবে—তবে উহা নিগুর্ণের অপরিমেয় শক্তির লীলাভূমি হইবে।

তাই নীলকণ্ঠ মহেশ্বরই জননীর একমাত্র নিত্য আসন—তাই বিরাট ঈশ্বরকে শাস্ত্র শুভ্র ও নীলকণ্ঠ বলিয়া দর্শন করিয়াছেন—তাই সমাধি অবস্থায় নীলিমার স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট শুভ্র জ্যোতিঃ সাধকের হৃদয় আলোকিত করে, এবং উহা হইতে সাধক স্পষ্ট বুঝিয়া লয়, তাহার নিজের হৃদয়ের

মত বিরাটেও শুভ্রত্ব ও নীলিমার অপূর্ব্ব সঙ্গম নিত্য বিরাজিত। তাই শিবের বুকে শ্যামার আসন।

আমি এইস্থলে পাঠকদিগকে এই পুস্তিকার মুখবন্ধটুকু পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করি। সাম্প্রদায়িক চক্ষে দর্শন করিলে এ পুস্তকের উদ্দেশ্য যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে না। পূর্ণ বৈজ্ঞানিক চক্ষে শুধু ভাব প্রমাণ ও সিদ্ধান্তের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহা পাঠ্য। শিব শ্যামা আদি নামের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাম্প্রদায়িক ভাবের ভিতর ভুলিয়া প্রবিষ্ট হইবেন না। ইহা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান—ইহা অধ্যাত্ম তত্ত্ব রহস্যের উদঘাটন—ইহা অনুসন্ধিৎসু মাত্রেরই বা সাধকমাত্রেরই অনুভাব্য। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার গণ্ডী তিল মাত্র ইহাতে নাই। "মা আমার কাল' কেন ?" নামক পুস্তিকা পাঠ করিয়া অনেকে এইরূপ ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন; সেইজন্য মুখবন্ধে আলোচনা করিয়াও এখানে একটু আভাস দিলাম।

যাহা হউক, বর্ণতত্ত্ব হিসাবে আমরা বুঝিলাম, শ্যামাঙ্গিনী মায়ের আমার অধিষ্ঠান একমাত্র

রজতবরণ শিবের বুকেই হইতে পারে। ব্রহ্ম-শক্তির বিমল আভাস একমাত্র যে জীব শিবত্ব লাভ করিয়াছে, তাহার হৃদয়েই সম্ভব। মা আমার বহু বর্ণবিশিষ্ট অসুররাশিকে গ্রাস করিতে করিতে শিবেরই বুকে চড়িয়া বসেন। জীবহৃদয়ে ভাবসকল ধীরে ধীরে ব্রহ্মমুখী হইতে থাকিলে ব্রহ্মগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে থাকিলে, শিবস্বরূপ একটি অবস্থার উপরি সে শক্তি অনুভূত হইয়া পড়ে। অসুরদলনী মা আমার বিচিত্র বর্ণাসুরসকলকে গ্রাস করিতে করিতে এইরূপে একবার শুভ্রস্বরূপ আধার পাইয়া প্রতিফলিত হইয়া পড়ে। অসুর দলন অনিবরত চলিতেছে, শিবরূপে যদি কেহ চরণে গড়াইয়া পড়িতে পারে, তবে সে হৃদয়ে উঁহার অনুভব আশা সম্ভব।

কিন্তু আমরা সে পৌরাণিক ইতিহাসের আলোচনা এখানে আর করিব না। শুধু বিজ্ঞান-মাত্র দেখিয়া যাইব! নতুবা প্রবন্ধ বৃহৎ হইয়া যাইবে।

বর্ণতত্ত্ব হিসাবে যেমন বুঝিলাম, গুণ হিসাবে দেখিলেও শুধু সেইজন্যই আমরা মহেশ্বরকে যোগী-রূপে দেখিতে পাই। যেখানে ভাবসকল বহির্মুখী না হইয়া অন্তর্মুখে প্রবেশ করিতেছে বা উর্দ্ধমুখী হইয়া আছে, তাহাই যোগাবস্থার লক্ষণ; এবং সেইরূপ যোগাবস্থাতেই ভাবসকল একধর্ম্মী হইয়া পড়ে—শুভ্র আলোকে হৃদয় ভরিয়া যায়—চাবি-ধার হইতে শক্তি সকল একীভূত হইয়া নিগু'ণরূপ বিরাট সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। সুতরাং সে মহেশ্বর যে ঐরূপ গুণসংযুক্ত, ইহা নিঃসংশয়-রূপে বলা যাইতে পারে; এবং তাই সে শুভ্র দেবতার শাস্ত্রে এইরূপ গুণ বর্ণনাই দেখিতে পাওয়া যায়; সেইজন্যই শাস্ত্রে মহেশ্বর লয়ের দেবতা বলিয়া উল্লিখিত। লয়শক্তিই নিগু'ণত্বের আসন—প্রলয় শক্তিই মহেশ্বর নামে অভিহিত।

রূপ ও গুণ হিসাবে বুঝিলাম, এইবার আসন তত্ত্ব বা সাধনার দ্বিতীয় স্তর আলোচনা করিয়া আমাদিগের আলোচ্য তত্ত্ব বিচার করিব।

আমি বলিয়াছি, সাধনার দ্বিতীয় স্তর আসন বিজ্ঞান মাত্র। এই অবস্থায় জীব ক্রমশঃ শিবত্ব লাভ করে বা ব্রহ্মময়ীর আসন রচনা করে। যোগশাস্ত্রের উল্লিখিত আসনের লক্ষণ এইরূপ স্থিরম্ "সুখমাসনম্।" যেরূপ ভাবে অবস্থান করিলে অঙ্গাদি স্থৈর্য্য লাভ করে ও সুখে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাই যোগশাস্ত্র আসন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বহিরঙ্গ সম্বন্ধেও যেমন, অন্তরঙ্গ সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। মন যে অবস্থায় অবস্থান করিয়া সুখে স্থির হইয়া থাকে তাহাই মনের প্রশান্ত আসন বুঝিতে হইবে! যথার্থ যোগের পক্ষে উহাই সাহার্য্যকারী। তোমার অনন্ত জীবনপ্রবাহের দ্বিতীয় স্তরের ইহাই সাধনা। তোমার কৈলাস আরোহণের ইহাই দ্বিতীয় সোপান।

কি প্রকারে এইরূপ আসনবদ্ধ হওয়া যায়। শক্তিতত্ত্ব বুঝিতে যাইলে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন বস্তুর উপর শক্তির প্রয়োগ করিলেও উহার

বাহ্য পরমাণুগুলি পরিচালিত হয়, অভ্যন্তরস্থ পরমাণুগুলি সমভাবে অবস্থান করে। তোমার মনকে বিরাট ব্রহ্মের একটী অভ্যন্তরস্থ পরমাণু বলিয়া ভাব। ওতপ্রোতভাবে তুমি ব্রহ্মনিমজ্জিত —ওতপ্রোতভাবে তুমি মাতৃঅঙ্কে অনুলিপ্ত— এইরূপ চিন্তা কর। যে বিরাটশক্তি সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত—যে বিরাট শক্তি সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবীরূপে আবর্ত্তিত, তোমাতেও সেই বিরাট শক্তি অনুস্যূত, এইরূপ ধারণা করিতে থাক। জলের মধ্যে যেমন জলকণা, বায়ুর মধ্যে যেমন বায়ুকণা, জ্যোতির অভ্যন্তরে যেমন জ্যোতি-কণা, বিরাট ব্রহ্মাণ্ডেরও অভ্যন্তরে তেমনই ব্রহ্মকণা বলিয়া আপনাকে মনে কর; খাইতে, শুইতে, বসিতে, এইরূপে তুমি আপনার চিন্তায় অভ্যস্ত হও, এইরূপে তোমার বহির্লক্ষ্য অন্তর্লক্ষ্যে পরিণত কর। জগতের সমস্ত ঝঞ্ঝাবাত তোমার উপর দিয়া বহিয়া গেলেও তুমি সুখে স্থিরভাবে অবস্থান করিবে। এমনই ভাবে—এমনই শক্তিসমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ শক্তিকণার মত—মাতৃগর্ভে শিশুর মত

আপনাকে লুকাইয়া ফেল। জগতের উত্তাল তরঙ্গ-রাশি অপ্রতিষ্ঠ করিতে পারিবে না !

যিনি বিশ্বেশ্বর—যিনি লোকসকলের একমাত্র প্রলয় অবস্থায় ধারণ কর্ত্তা—শত শত ব্রহ্মা, বিষ্ণু যাঁহার চরণ-পূজায় ব্যস্ত, সেই বিরাট মহেশ্বর অহর্নিশ এইরূপ আসনে উপবিষ্ট বলিয়াই, যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই যোগাসনে অবস্থিত বলিয়াই, মা আমার তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরীরূপে বিরাজিতা। সৃষ্টিচক্রের কোটী কোটী চন্দ্র সূর্য্যের উৎপাদনে তাঁহার এ যোগাসন ভাঙ্গে নাই—বিষ্ণুমায়ার অপরিমেয় বিস্তারে তাঁহার আসন টলে নাই। তাঁহার প্রাণশক্তির অহর্নিশ ঊর্দ্ধগতি তাঁহাকে অবিচঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে। সে ঊর্দ্ধ টানের আকর্ষণে বিশ্বচক্র প্রলয়ের দিকে ছুটিতেছে—স্রোতস্থ তৃণের মত জীব, জড়, দেবতাবর্গ ব্রহ্ম-মুখে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটিয়াছে—সেটানের দমকে দমকে মহাপ্রলয় সংসাধিত হইতেছে—বিরামে ব্রহ্মা সৃষ্টির অবসর পাইতেছে—বিষ্ণুমায়ার মোহিনী শক্তি সে উল্লাসযাত্রা ক্ষণেকের জন্য ভুলাইয়া দিয়া

বিচ্ছেদে প্রণয়বর্দ্ধনের মত সে মহাযাত্রার আনন্দকে দ্বিগুণিত করিয়া দিতেছে।

তোমরা সেই টানে গা ভাসাইতে অভ্যস্ত হও তুমি সেই আদর্শে আসন প্রস্তুত কর—সেইরূপ আসনোপবিষ্ট হইবার অধিকারী হইতে যত্নবান হও—তুমি এ মহাযাত্রার যাত্রীবৃন্দের অগ্রণী হইবে।

অন্য আসন অঙ্গপীড়ন মাত্র।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শব-সাধনা

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিশ্বজীবন শবসাধনায় বিভোর—প্রতি পরমাণু শবসাধনায় ব্যাপৃত—মনুষ্য-জীবন এই শব-সাধনার মহারাত্রি—মায়ারূপ রজ্জু দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটী স্তম্ভে আমাদিগের সংস্কারাত্মক দেহ চারিধারে নিবদ্ধ—অহর্নিশ পরিবর্ত্তনরূপ মৃত্যুক্ষেত্রে বা শ্মশানে এ আসন প্রতিষ্ঠিত—নিত্য যৌবনোন্মেষ সম্পন্ন আত্মা এই শ্মশানক্ষেত্রে উপবিষ্ট হইয়া সাধনায় ব্যাপৃত। তোমরা স্থিরচিত্তে এ চিত্র দর্শন কর!

জন্ম জন্ম ধরিয়া এ সাধনা চলিয়াছে। প্রলয়ের পর প্রলয় বহিয়া চলিয়াছে—প্রলয়ের পর প্রলয়, প্রহরের পর প্রহরের মত অতীত হইতেছে রুদ্রের পর রুদ্র শিবারবে মরণের তাণ্ডব নৃত্যকে

রবমুখরিত করিতেছে—যুবক সাধক অবিকম্পিত-স্থির। তোমরা নিবিষ্টচিত্তে নির্জ্জনে এ স্থৈর্য্য উপলব্ধি কর।

আমাদিগের সাধনা চলিয়াছে। যত আমরা অন্তর্মুখী হইতে চাহি—যত আমরা চারিদিক হইতে গুটাইয়া অন্তরে আপনাকে ঘনীভূত করিতে চাহি, ততই আমাদের এ সংস্কারাত্মক শবদেহ কাঁপিয়া উঠে ততই স্তম্ভে টান পড়ে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি স্তম্ভ ততই দেহকে আকর্ষণ করে—আমাদিগের সংস্কার ততই আমাদিগকে আসনচ্যুত করিতে বিচলিত হইয়া উঠে।

তোমার আসনের যখন এ কম্পন অনুভব করিবে—তোমার শবদেহ, তোমার ঐ সাধনায় প্রতিরোধ করিতে চঞ্চল হইয়াছে বলিয়া যখনই অনুভব করিবে, তখনই বুঝিবে, তোমার সাধন ঠিক চলিয়াছে। ভীত হইও না—আসন পরিত্যাগ করিও না, উহা বিফলতার প্রাণশোষী হুঙ্কার নহে —উহা আশার সুদূরাগত মৃতসঞ্জীবনী ঝঙ্কার। তুমি দ্বিগুণ উৎসাহে সাহসে হৃদয় বাঁধিবে।

কত ভীতির ছবি প্রাণে জাগিবে—কত মমতা—কত রকমে ছায়াবাজীর মত ফুটিয়া উঠিয়া তোমার আরোহণের পথে তোমাকে গতিরুদ্ধ করিয়া দাঁড় করাইতে প্রয়াস পাইবে—জানিও তাহার প্রত্যেকের ভিতর মরণ লুক্কায়িত।

তুমি মরিতেছ, জন্মিতেছ, ফুটিতেছ, মিলাইয়া যাইতেছ—এ সমস্ত তোমার শ্বাস প্রশ্বাস মাত্র। একটী জন্ম তোমার একটী শ্বাস—একটী মরণ তোমার একটী প্রশ্বাস। তুমি আপনার শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দে চমকিত হইও না।

এই শ্বাস প্রশ্বাসরূপ প্রাণক্রিয়া—এই মরণ জীবনরূপ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিবে। নিবিষ্টচিত্তে একবার ঈশ্বরচিন্তা করিতে বসিলে বা কোন প্রকারে ধ্যানস্থ হইতে থাকিলে আমাদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাস যেমন মন্দীভূত হইয়া আসিয়া ক্রমশঃ নাসাভ্যন্তরচারী ও অবশেষে রুদ্ধ গতিহীন হইয়া যায়—তোমার এই জীবন

মরণরূপ শ্বাস প্রশ্বাস তদ্রূপ ক্রমশঃ মন্দীভূত ও মিলাইয়া আসিবে।

ধ্যানস্থ হইতে গেলে দেখা যায়, শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য পড়িলেই শ্বাস আবার ঘন হয়; **তুমি জীবন মরণের দিকে চাহিও না, চাহিলেই শ্বাস আবার খরবাহী হইবে।**

ইহা তোমার হঠ প্রাণায়াম নহে। **ইহা আমার অনাদি অনন্ত লয় যোগ।**

এইরূপ শ্বাসে শ্বাসে প্রণব যপ কর—এই জন্ম মৃত্যুরূপ শ্বাসে শ্বাসে প্রণবের একটানা প্রবাহ পরিজ্ঞাত হও। তুমি স্থিরতর হইবে।

তুমি মুহূর্ত্ত ফাঁক দিও না। প্রতি মুহূর্ত্ত অপেক্ষায় কাটাও। মনে হইবে, তুমি আসনচ্যুত হইয়াছ—মনে হইবে, তুমি পড়িয়া গিয়াছ—মনে হইবে, তুমি বুঝি অধোগতির শ্মাশানভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছ। সে সব ভ্রান্তি! **ভয় পাইও না, তুমি ঠিক আছ।**

মায়ার চক্রে এইরূপ কত বিভীষিকা আসিতেছে। কখনও ধার্ম্মিক কখনও অধার্ম্মিক

—কখনও ধনী কখনও দরিদ্র—কখনও সম্মান গৌরব—কখনও অপমান লাঞ্ছনা—কখনও জ্ঞান-গিরি-শিরে কখনও অজ্ঞতার অন্ধকুপে ; এমন কত আসিতেছে, তুমি ওদিকে চাহিও না! কখনও নিস্ফলতার দুরন্ত আক্ষেপ—কখনও সিদ্ধির অমূল্য আস্পদ এমন কত কি—ও সকল মৃত দেহের বৃথা কম্পন—তুমি চাহিও না।

দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, তৃতীয় প্রহর আগত। আর ক্ষণকাল অপেক্ষা কর! গুরুর আদেশ বিস্মৃত হইও না—আসনচ্যুতি হইয়াছে ভাবিও না। এখনই জগতের রোল তোমার শ্রবণ হইতে দূরীভূত হইবে—এখনই মায়া-আকা-শের নক্ষত্ররাজি তোমার চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইবে। তুমি কান বাড়াইয়া থাক—তুমি চক্ষু পাতিয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া থাক।

তুমি কারাগারে অথবা রাজসিংহাসনে—তুমি বৃক্ষতলে অথবা হর্ম্ম্যমাঝে—তুমি বিদ্যার কলরবে অথবা মুর্খতার নির্জ্জনতায়—তুমি সমাজের শীর্ষে অথবা সংস্কারের পদতলে। যেখানেই তোমার

অবস্থান হউক, জানিও তোমার আসনচ্যুতি ঘটে নাই - ঠিক আছে।

তোমার এই আসনের দিকে লক্ষ্য রাখ— তোমার এ সিদ্ধাসনের কথা ভুলিও না। মা আগতপ্রায়।

দুরন্ত শ্মশানক্ষেত্রে চঞ্চল এ শবদেহোপরে তোমার মাতৃস্মরণের অশ্রুজল বিফল হয় নাই— মাতৃ অভাবের প্রতি উচ্ছাস, মাতৃহৃদয়ে স্নেহ-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ রচনা করিতেছে, তোমার সরল প্রাণের একটা মাত্র সরল মাতৃ-আহ্বান মায়ের আনন্দ-নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিয়াছে—তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের তিলমাত্র তৃষ্ণা মাতৃ-স্তনে অমৃতধারা নামাইয়াছে। বৎসহারা মাতৃপ্রাণের ভাব অনন্ত কোটী সন্তানের মা হইলেও তবু তাহার প্রাণে জাগিয়াছে। তিলমাত্র অপেক্ষা কর।

তুমি মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ—তুমি ক্রন্দনে মাকে ভুলাইবার অবসর পাইয়াছ, তোমার আর ভাবনা কি?

শিশুর ধর্ম্ম ভোরে ঘুম ভাঙ্গা। তুমি মনুষ্য কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ—তুমি মায়ের অভাব অনুভব করিয়াছ—বুঝিতে হইবে, ভোর হইয়াছে। আরে মাতৃ ক্রোড়স্থ শিশু! কাঁদিয়া উঠ, আর ভাবনা কি!

সমাপ্ত।